সাতদিন

১৮ জুলাই : নওগাঁর সাপাহার সীমান্তে পাঁচ ভারতীয়কে পুশইনের ৩ ঘণ্টা পরে বিডিআর পুনরায় পুশব্যাক করেছে।

১৯ জুলাই : রাজশাহী মহানগরীর একটি নির্জন বাড়ি থেকে বাংলা ভাইয়ের ১১ ক্যাডারকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে।

দুই মাসে ও কম সময়ের মধ্যে আবার জ্বালানি তেলের দাম বাড়িয়েছে সরকার।

২০ জুলাই : সাভার ইপিজেডে শ্রমিকদের ওপর পুলিশের লাঠিচার্জ ও রাবার বুলেট নিক্ষেপে দুই শতাধিক মহিলা ও পুরুষ শ্রমিক আহত হয়েছে।

২১ জুলাই : আগ্নেয়াস্ত্র মামলায় ফাঁসিয়ে দেয়ার হুমকি দিয়ে ৫ পুলিশ ২৮ হাজার টাকা ছিনতাই করেছে।

২২ জুলাই : রুমা উপজেলায় বেতছড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে বিপুলসংখ্যক সামরিক সরঞ্জাম উদ্ধার করেছে সেনা সদস্যরা।

২৩ জুলাই : বিস্ফোরিত ট্রান্সফরমার ব্রেকার ত্বরিত মেরামতের ব্যর্থতায় চট্টগ্রাম মহানগরীর প্রায় ২০ লাখ মানুষ সীমাহীন ভোগান্তির শিকার হয়েছে।

২৪ জুলাই : আগামী বৃহস্পতিবার থেকে সিএন্ডএফ এসোসিয়েশনসহ স্থলবন্দর ব্যবহারকারী ৪টি সংগঠন বেনাপোলে অনির্দিষ্টকালের জন্য কর্মবিরতি শুরু করার ঘোষণা দিয়েছে।

jvB‡mÝavix gv¯—vb

আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় নিয়োজিত বাহিনী পুলিশ ক্রমেই নানা বিতর্কে জড়িয়ে পড়ছে। হারাচ্ছে তাদের পেশাগত গৌরব। রাজধানীর বিভিন্ন-জায়গায় পুলিশ সদস্যরা একের পর এক ছিনতাই, চাঁদাবাজিসহ নানা অপরাধের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছে। রাজধানীতে গত ছয় মাসে পুলিশের বিরুদ্ধে ছিনতাই-চাঁদাবাজির ঘটনা প্রমাণিত হওয়ায় ৫ জন ট্রাফিক সার্জেন্টকে চিহ্নিত করে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে। পাশাপাশি ১৮ পুলিশ সদস্যের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। তারপরও পুলিশের চাঁদাবাজি এবং ছিনতাই তৎপরতা কমেনি বরং আশঙ্কাজনকভাবে বেড়ে চলেছে।

আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়নের জন্য র‍্যাব গঠন করা হলেও এর ভূমিকা সমালোচনার উর্ধ্বে নয়। বরং অস্ত্র মামলার ভয় দেখিয়ে ক্রসফায়ারের হুমকি দিয় চাঁদা আদায়ের ঘটনায় জড়িয়ে পড়ছে র‍্যাব, চিতা, কোবরা।

গত ২১ জুলাই রাজধানীর তাঁতীবাজারে অস্ত্র মামলায় নাম ঢুকিয়ে ক্রসফায়ারের হুমকি দিয়ে পুলিশ সদস্যরা ব্যবসায়ীর কাছ থেকে টাকা ও রুপার অলঙ্কারভর্তি ব্যাগ ছিনিয়ে নেয়। ছিনতাইয়ের অভিযোগে গ্রেপ্তারকৃত আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা হলো কোতোয়ালি থানার এএসআই খলিলউল্লাহ, নায়েক বারী, কনস্টেবল শামসুজ্জামান ও কোরবান আলী, রাজধানীর একটি মানি এক্সেচেঞ্জের মালিকের কাছ থেকে ১৪ লাখ টাকা ছিনতাইয়ের জন্য পুলিশ সার্জেন্ট গ্রেপ্তার হওয়ার ১ মাসের মাথায় এ ধরনের ঘটনা ঘটলো।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরপরাধ ছাত্র মাসুমকে বিনা কারণে গুলি করে হত্যা এবং ব্যবসায়ী আবু বকর সুলতানকে পিটিয়ে আজীবনের জন্য পঙ্গু করে দেয়া সম্প্রতি সারা দেশে ব্যাপক আলোড়ন তুলেছে। ছিনতাই, চাঁদাবাজি ও ডাকাতিসহ বিভিন্ন অপরাধে জড়িত থাকার অভিযোগে গত আড়াই বছরে সারা দেশে ৩৬ হাজারের বেশি পুলিশকে সাজা দেয়া হয়েছে। এদের মধ্যে বড় ধরনের শাস্তি দেয়া হয়েছে ৩ হাজার ৬০০ পুলিশকে। শাস্তিপ্রাপ্ত পুলিশ সদস্যদের মধ্যে ইন্সপেক্টর থেকে শুরু করে কনস্টেবল পদমর্যাদার পুলিশের সংখ্যাই বেশি। পুলিশকে আইন ও স্পেশাল অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী শাস্তি দেয়া হয়েছে। তারপরও পুলিশের চাঁদাবাজি ও ছিনতাই কমছে না।

আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা ক্রমেই অপরাধের সঙ্গে জড়িয়ে পড়া প্রসঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষিকা প্রফেসর মাসুদা এম রশীদ চৌধুরী সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'সাধারণত দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেরা পুলিশের চাকরিতে নিয়োগ পায়। অনেক ক্ষেত্রে তারা চাকরিই নেয় উৎকোচ দিয়ে পুলিশে নিয়োগ পাওয়ার পর পুষিয়ে নেয়ার জন্য ডাকাতি, ছিনতাই ও চাঁদাবাজি করে। দ্রুত অর্থনৈতিক স্বাবলম্বী হওয়ার জন্যই তারা এ অপরাধে জড়িয়ে পড়ে।

সম্প্রতি সার্জেন্ট আসাদুজ্জামান আসাদ, মনিরুল ইসলাম, মাহফুজ, জলফিকার আলী ও রফিকের চাঁদাবাজি, অপহরণ এবং

ছিনতাইয়ের ঘটনায় পুলিশের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। কেরানীগঞ্জের ওসি মোস্তাফিজুর রহমান তার বিতর্কিত ভূমিকা কারণে সারা বছর মিডিয়ায় আলোচিত হয়েছেন। র‍্যাবে বিতর্কিত হয়ে পড়েছেন এএসপি আশরাফুল হক এবং তার স্ত্রী ফরিদা ও মেজর হাফিজ। আইনশৃঙ্খলায় নিয়োজিত বাহিনীর সদস্য হিসেব পুলিশের এ বিতর্কিত ভূমিকায় পুলিশের আইজি আব্দুল কাইয়ুমের কাছে জানার জন্য বাসা ও অফিসে বারবার যোগাযোগ করেও তার মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

বর্তমানে পুলিশের ভূমিকায় প্রমাণিত হয়েছে, পুলিশ হচ্ছে মাস্তানের ওপরের মাস্তান। অর্থাৎ লাইসেন্সধারী মাস্তান। বিভিন্ন অপরাধে দায়ী পুলিশদের যেমন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হওয়া দরকার, তেমনি সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং পুলিশের পদস্থ কর্মকর্তারা তাদের দায়-দায়িত্ব এড়াতে পারেন না। পুলিশের কাছে জনগণ নিরাপত্তা চায়, আতঙ্ক বা সন্ত্রাস চায় না।

খোন্দকার তাজউদ্দিন

জাপানে ভূমিকম্প

ভূমিকম্পের দেশ জাপান। প্রায় প্রতিদিন ভূমিকম্প হচ্ছে জাপানের কোনো না কোনো অংশে। এর পরিমাণ সংখ্যায় এতই যে, রিখটার স্কেলে চারের নিচে হলে সাধারণত খবরের কাগজে আসে না এবং তিন বা ততোধিত হলে টেলিভিশন খবরে প্রচার পায়।

২৩ জুলাই স্থানীয় সময় বিকাল ৪.২৫ টার সময় Tokyo, Chiba, Saitama, Kianagawa এবং এ আশপাশ এলাকায় বড় ধরনের একটি ভূমিকম্প আঘাত হানে। রিখটার স্কেলে যার Magnitude-এর পরিমাণ ছিল ৬.০, এর উৎপত্তি হয় মূলত চিবা কেনে, এবং টোকিও'র আদাচি-ওয়ার্ডে সবচেয়ে বেশি অনুভূত হয়। ১৯৯২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আঘাত হানার ১৩ বছর পর এই প্রথমবার টোকিও মেট্রোপলিটনের ২৩টি ওয়ার্ডে এমন বড় ধরনের ভূমিকম্প আঘাত হানে।

সমুদ্রের তীরে বিশেষ করে চিবা (উৎপত্তিস্থল) এবং কানাগাওয়া হলেও বিশেষজ্ঞরা সুনামি (Tsunami) হওয়ার আশঙ্কাকে নাকচ করে দিয়েছেন। তবে আরো বেশ কয়েকবার এ ধরনের কম্পন অনুভূত হবে বলে সতর্ক করে দেন।

ভূমিকম্পের ফলে বুলেট ট্রেন (Shinkan Sen) তাৎক্ষণিকভাবে (Tokyo Shizuoka) কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং Tohoku ও Joetsu Shinkansen কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ রেখে নিরাপদ চেক করার পর পুনরায় আরম্ভ করা হয়। এছাড়া পূর্ব জাপান রেলওয়ে (JR), মেট্রো সাবওয়ে, প্রাইভেট রেলওয়ে এবং মনোরেল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ঘরমুখো যাত্রীদের সমস্যায় পড়তে হয়েছিল সেদিন।

রাহমান মণি ও কাজী ইনসান

খরচের খাতায় জাতীয় 'আফতাব আহমেদ!'

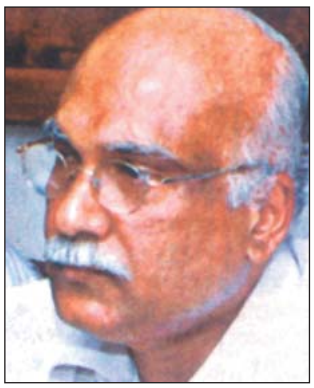

আফতাব আহমেদ

আফতাব আহমেদ। সম্ভবত তার প্রিয় পাখি দোয়েল নয়। কারণ দোয়েল 'জাতীয়' পাখি। তার প্রিয় ফল সম্ভবত কাঁঠাল নয়। কাঁঠাল খেলে পেটে সমস্যা হতে পারে। এ ছাড়া আরও একটা কারণ, কাঁঠাল 'জাতীয়' ফল। ছোটবেলা থেকে বড় হয়ে উঠতে উঠতে আফতাব আহমেদ বোধকরি কোনোদিন হাডুডু খেলেননি। কারণ হাডুডু জাতীয় খেলা। প্রিয়তমাকে ফুল দেয় অনেকেই। ফুল দিয়ে ঘরও সাজানো হয়। 'শাপলা' দিয়ে এসব কখনোও আফতাব আহমেদ করেছেন বলে মনে হয় না। শাপলা জাতীয় ফুল বলে কথা! তাহলে কি এ কথা সত্য, জনাব আফতাব আহমেদের 'জাতীয়' কোনো কিছু সহ্য হয় না? না হলে ১৯৯৬ সালে কেনই বা তিনি জাতীয় সঙ্গীত নিয়ে কটূক্তি করবেন, কেনই বা ২০০১ সালে জাতীয় সঙ্গীত বদলের প্রস্তাব দিয়ে দারুণ নিন্দিত হবেন?

এই সব 'জাতীয়' সহ্য না হবার ব্যাপারটা জনাব আফতাব আহমেদসহ তাবৎ দেশবাসী জানলেও প্রধানমন্ত্রী সম্ভবত সেটা বুঝতে পারেননি। আর তাই ২০০১ সালে দারুণ নিন্দিত হওয়া এই 'পচা বাম' আফতাব আহমেদকে আরেক 'জাতীয়' জিনিস ধরিয়ে দেয়া হয়, যার নাম জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। আফতাব আহমেদ উপাচার্য হয়ে যান। কিন্তু কী আর করা? কাঁঠাল পেটে সহ্য না হলে যেভাবে বেরিয়ে আসে, শেষমেশ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেক সেভাবে আফতাব আহমেদকে বের করে আনলো সরকার। জোট সরকারের 'উপাচার্য কপাল' খুব খারাপ। না হলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আনোয়ার চৌধুরী, এরপর জাহাঙ্গীরনগরের ভিসি আর শেষমেশ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে এভাবে সরিয়ে আনতে হয়?

একনজরে ২১৪ দিন

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে জিয়াউর রহমানের নামে নামকরণ করার সব ব্যবস্থাই করেছিলেন আফতাব আহমেদ। কিন্তু জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকা ২১৪ দিনে ভদ্রলোক আরো অনেক অসম্ভবকে সম্ভব করেছিলেন। যেমন -

* এক সিন্ডিকেট সভাতেই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ৬০৫টি পদ সৃষ্টি করে তিনি বিশ্ব রেকর্ড গড়েছিলেন (এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো অর্গানোগ্রাম নাকি ছিল না। সেই সুযোগে এসব করা হয়েছিল)। ষোল ঘন্টায় ৪৫০ জনের ইন্টারভিউ নিয়েও বিশ্বরেকর্ড তৈরি করেছিলেন।

* দায়িত্ব নেয়ার ১০০ দিনের মধ্যে ভদ্রলোক এডহক ভিত্তিতে ১০৬৪জন কে 'অপ্রয়োজনীয়' নিয়োগ দিয়েছিলেন। এর ভেতরে শ'দুয়েক ছিল শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী এহছানুল হক মিলন সাহেবের লোক, যাদের সবার বাড়ি চাঁদপুর। আফতাব আহমেদ বলতেন, 'মিলন' তার ছাত্র। তাই ছাত্রের সঙ্গে মিলে...

* এমন নিয়োগ মন্ত্রণালয় পুরোপুরি অনুমোদন দেয়নি। মন্ত্রণালয়ের সচিব থেকে শুরু করে অনেক অধঃস্তনকে তিনি অপমান করেছিলেন। দিনের পর দিন তাদের কোনো চিঠির উত্তর দেননি। ১৫ বছরের অধ্যাপনা কিংবা অধ্যক্ষ হবার অভিজ্ঞতা কোনোটাই না থাকলেও সাবেক শিবির নেতা আব্দুর রশীদকে একটা বিশাল পদে নিয়োগ দিয়েছিলেন আফতাব আহমেদ। একদিনও ক্লাস না নেয়ার অভিজ্ঞতা থাকলেও সাবেক ব্যাংকার মুহম্মদ

ইব্রাহিমকে নিয়োগ দিয়েছিলেন তিনি। শুধু তাই নয়, টমেটোর ভ্যান থেকে ছিনতাই করার কারণে যে ছাত্রদল ক্যাডারদের পুলিশ গ্রেপ্তার করেছিল, এ সরকারের আমলেই তাকেও তিনি চাকরি দিয়েছিলেন। শ্রদ্ধেয় আফতাব আহমেদের এ গণনিয়োগের সফলতায় নতুন 'চাকরি মন্ত্রণালয়' খুলে তাকে এর প্রধান বানানো যেতে পারে!

* আফতাব আহমেদের সময়েই ডিগ্রি পরীক্ষার ভাগ ৬০ ফলাফলে ভুল ধরা পড়ে। লাখ লাখ শিক্ষার্থীর শিক্ষাজীবন থমকে যায় কিছুদিনের জন্য। দৌড়াদৌড়ি পড়ে যায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অফিসে।

* সুলতানা রাজিয়া জুঁই। মফস্বলের কোনো এক সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ের নামহীন একজনকে তুলে এনে সরাসরি উপ-রেজিস্টার বানিয়ে দিয়েছিলেন। অবশ্য পরে তাকে বরখাস্তও করেন আফতাব আহমেদ। তার আগে জুঁই অভিযোগ করেন, ছুটির দিনে আফতাব আহমেদ তাকে তার বাসার লাইব্রেরিতে যেতে বলেন। এভাবে লিপিও আসে, বিউটিও আসে, তোমার আপত্তি কোথায়! এরপর লাইব্রেরিতে জুঁইয়ের সঙ্গে তিনি কী করতে উদ্যত হয়েছিলেন? জুইয়ের সেই অভিযোগ এখন না তোলাই ভালো!

খরচের খাতায়

আফতাব আহমেদের পালিত কন্যা যখন রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ফাইনাল পরীক্ষা দেন তখনো আফতাব সাহেবের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। নিয়ম লঙ্ঘন করে ২১৮ নং কোর্সের খাতা শুধু তিনিই দেখেছিলেন। তার পরীক্ষা হলে ভদ্রলোক নাকি তিন ঘণ্টা দাঁড়িয়ে ছিলেন।

আফতাব সাহেব ছাত্র বয়স থেকেই দারুণ মেধাবী ছিলেন। ছিলেন তুখোড় ছাত্রনেতা। কিন্তু বন্ধুরা তার সম্পর্কে একটাই অভিযোগ করতেন। ছোটবেলা থেকেই ভদ্রলোক নাকি ছিলেন 'দারুণ এক্সট্রিমিস্ট'! এই এক্সট্রিমিস্ট যুবা যোগ দিয়েছিলেন ছাত্রলীগে। অতঃপর চীনাপন্থি কমিউনিস্ট হয়েছিলেন। তবে ১৯৭২ সালে 'গণকণ্ঠ' বের করে বেশ সাড়া ফেলে দিয়েছিলেন। ভদ্রলোক গণকণ্ঠের নির্বাহী সম্পাদক ছিলেন। এখনও গর্ব করে বলেন, ২২ বছর বয়সেই তিনি পত্রিকার প্রধান নির্বাহী হতে পেরেছিলেন। সাংবাদিকদের তাই তিনি থোড়াই কেয়ার করেন!

গণকণ্ঠ বন্ধ হয়ে যাবার পর ১৯৭৪ সালে তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন। ১৯৯৪ সালে চলে আসেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। বাম পচলে কী হয় সেটা না বলাই ভালো। সাংবাদিকদের থোড়াই কেয়ার করলেও তিনি 'সংবাদ' হতে বাদ থাকেননি। যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নামকরণ তিনি জিয়াউর রহমানের নামে করে এসেছিলেন, তার জীবনী লেখার কথা বলে বাংলা একাডেমী থেকে আট লাখ টাকা নেবার পরও জীবনী লিখে বাংলা একাডেমীতে তা আর জমা দেয়া হয়নি।

মেধাবী আফতাব আহমেদের জীবনে অনেক কিছুই আসলে জমা পড়েনি। তবে জিয়াউর রহমানের জীবনী লিখে জমা না দেয়া, কেলেঙ্কারি, গণনিয়োগ এসব করে সরকারের ইমেজটাকে তিনি মানুষের মনে ভালো হিসেবে জমা করতে পারেননি। তিনি খরচ হয়ে গেছেন, তাকে জমার খাতায় আর কেউ তুলবে বলে মনেও হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : অনেক অনেক পুরনো একটা কৌতুক এমন- এক ছেলে লোভনীয় চকোলেট বিক্রি করে। তার কি লোভ লাগে না? এক বয়স্ক লোক তার নাতিকে চকোলেট কিনে দেবার পর দোকানদার ছেলেকে জিজ্ঞেস করলে তোমার কি জিভে পানি আসে না? দোকানদার ছেলেটি বললো, আসো তো। তখন আমি গোপনে চকোলেটের প্যাকেট খুলে একটু চুষি। তারপর আবার প্যাকেটে রেখে দেই।

আফতার আহমেদ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ পেয়েছিলেন কোনো এক 'চকোলেট'-এর কল্যাণে। চকোলেট হিসেবে চুষে 'ছোবড়া' হয়ে যাবার পর পুনরায় প্যাকেটবন্দি করে তাকে পাঠানো হয়েছে তার আগের কার্যক্ষেত্র অর্থাৎ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ইদানীং খাবারে ভেজাল কিংবা বিষাক্ত কিছু মেশানো হচ্ছে কি না তা নিয়ে রিপোর্ট বেরুচ্ছে, রাস্তায় মোবাইল কোর্ট নেমেছে। তাদের মধ্যে কেউ কি আছেন যারা এই সব চকোলেটদের তুলে এনে ডাস্টবিনে ফেলে দিতে পারেন?

Kmunad 02@yahoo.com

যত দোষ নন্দ ঘোষ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে পরীক্ষিত এক প্রবাদ 'যত দোষ নন্দ ঘোষ'। এর যথার্থতা অতীতেও ছিল। আজও আছে। মনে হচ্ছে প্রবাদটি বিশ্ববিদ্যালয়ে চিরায়ত সত্যে রূপ পেয়েছে।

কর্তৃপক্ষের অবহেলা এবং অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে আন্দোলনে বরাবরই এগিয়ে আসে শিক্ষার্থীরা। কর্তৃপক্ষের উদাসীনতা যেমন নিয়মিত, শিক্ষার্থীদের আন্দোলনও তেমনি নিয়মিত। সেই দাবি কতটা বাস্তবায়িত হয় আর তার পরিণতি কী দাঁড়ায় ভাবলে বিবমিষা জাগে। শামসুন্নাহার হল ট্র্যাজেডি ও ভিসিবিরোধী আন্দোলনে আমরা দেখেছি পদত্যাগ করেছেন ভিসি। কিন্তু তারপর কী হলো? রাষ্ট্রদূত হয়ে বিদেশে পাড়ি জমালেন পদত্যাগী ভিসি। আর এদিকে আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারীদের খুঁজতে গঠন করা হলো তদন্ত কমিটি। পরবর্তীতে আরো বেশ কিছু আন্দোলনে দেখা গেছে একই চিত্র।

সম্প্রতিকালে ফজিলাতুন্নেসা মুজিব হলের শিক্ষার্থীরা তাদের কয়েকটি মৌলিক অধিকার আদায়ের আন্দোলনে নামে। এই আন্দোলনের বিষয় ১৩ দফা দাবি। মূল দাবি প্রভোস্টের পদত্যাগ। চাপের মুখে পদত্যাগ করেছেন প্রভোস্ট অধ্যাপক নাসরীন আহমাদ। কিন্তু পরের পরিস্থিতি যথারীতি! ঐতিহ্যগত পুনরাবৃত্তি। ২১ জন মেয়েকে করা হয়েছে তালিকাভুক্ত। গঠন করা হয়েছে তদন্ত কমিটি। প্রতিবাদী সংলাপ ছুঁড়ছেন শিক্ষকরা। ৭২ ঘন্টার আলটিমেটাম বেঁধে দিয়েছে শিক্ষক সমিতি। তদন্ত কমিটির ওপর চাপ প্রয়োগ চলছে। শিক্ষার্থীদের বহিষ্কার দাবি করছেন শিক্ষকরা। এ কেমন অদ্ভুত দাবি! কিসের দোষে বহিষ্কার করা হবে শিক্ষার্থীদের? প্রতিবাদ জানানোর জন্য? তাহলে কি অন্যায়ের প্রতিবাদ করা যাবে না?

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি হলে রয়েছে প্রভোস্ট বাংলো। আবাসিক শিক্ষার্থীদের অভিভাবক, প্রভোস্ট যাতে শিক্ষার্থীদের কাছে থাকতে পারেন, সার্বক্ষণিক সুযোগ-সুবিধা দেখতে পারেন। কিন্তু প্রভোস্ট যদি বাংলোয় না থেকে তার বাসায় থাকেন তাহলে প্রয়োজনে তাকে কাছে পাবে না শিক্ষার্থীরা। এটা খুবই স্বাভাবিক বিষয়। যে প্রভোস্ট বাংলোয় থাকবেন না, শিক্ষার্থীরা যাকে কাছে পাবে না, তার পদ নিয়ে প্রশ্ন তোলাটা স্বাভাবিক নয় কী? তাহলে শিক্ষার্থীদের দোষ কোথায়? কেন তাদের তালিকাভুক্ত করা হচ্ছে? অন্যায়ের প্রতিবাদ করা শিক্ষার্থীদের গণতান্ত্রিক অধিকার। সেই অধিকার প্রয়োগ করলে কি শাস্তি অনিবার্য? বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি দেখে মনে হচ্ছে 'যত দোষ নন্দ ঘোষ'। কর্তৃপক্ষ যা-ই করুক দোষ পড়বে শিক্ষার্থীদের ওপর। এটা কোনো সুশীল সমাজের শোভন কাজ নয়।

৮ বছরেও জেলা বিএনপির সম্মেলন হয়নি

দীর্ঘ ৮ বছর পার হয়ে গেলেও যশোর জেলা বিএনপির সম্মেলন হচ্ছে না। আজ-কাল করতে করতে শুধু সময় পেরিয়ে যাচ্ছে। নতুন নেতৃত্ব না আসায় কর্মীরা হয়ে পড়ছেন হতাশ।

বারবার সম্মেলনের তারিখ নির্ধারণ এবং ঠিক শেষ মুহূর্তে এসে তা স্থগিত হয়ে যাওয়ায় চরমভাবে এর বিরূপ প্রভাব পড়ছে দলের ওপর। অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, এখন স্বল্প সময়ের ব্যবধানে সম্মেলন হবে কি না এ নিয়েও অনেকে সন্দিহান!

দলীয় সূত্রে জানা যায়, যশোর জেলা বিএনপির সর্বশেষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ৮ বছর আগে। এতে চৌধুরী শহিদুল ইসলাম নয়ন সভাপতি ও কাজী মুনিরুল হুদা সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন। এরপর মোট ১২ বার সম্মেলনের দিনক্ষণ নির্ধারণ করা হলেও অজ্ঞাত কারণে তা হয়নি। প্রতিবারই ঘটেছে একই ধরনের ঘটনা। শেষ মুহূর্তে এসে নানা অজুহাত দেখিয়ে স্থগিত করে দেয়া হয়েছে সম্মেলন। এভাবে প্রতিবারই নতুন নেতৃত্ব পাওয়ার আশায় উন্মুখ হয়ে থাকা কর্মীরা হয়েছেন হতাশ। অপরদিকে প্রচার-প্রচারণা ছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ পদে লড়াই করার মানসিকতা নিয়েও শেষ পর্যন্ত তা না হওয়ায় ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছেন নেতারা। তারা এখন আর আকার-ইঙ্গিতে নয় প্রকাশ্যেই বলছেন, মন্ত্রী তরিকুল ইসলাম ছাড়াও জেলা বিএনপির একটি অংশের অনাগ্রহের কারণেই সম্মেলন হচ্ছে না। তারা চাচ্ছে না নতুন নেতৃত্ব আসুক।

এ বছরের শুরু থেকেই যশোর জেলা বিএনপির সম্মেলনের বিষয়টি বেশ গুরুত্ব পায়। প্রস্তুতি ও তোড়জোড় এমন ছিল যে, এবার বোধ হয় সম্মেলন হয়েই যাবে। কিন্তু শেষ পরিণতি ঐ একই। সর্বশেষ সম্মেলনের দিনক্ষণ নির্ধারণ করা হয়েছিল গত ১৬ জুন। সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ক বিএনপির কেন্দ্রীয় তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক এবং শার্শা উপজেলা বিএনপির সভাপতি শফিকুল হাসান তৃপ্তি দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, এবার সম্মেলন হবেই। কিন্তু সম্মেলন যে হবে না তা বোঝা যায় এক সপ্তাহ আগেই। ১০ জুন সাবজেক্ট কমিটির সভায় নেতৃত্ব নির্বাচন নিয়ে সংকট সৃষ্টি হওয়ায় ১৬ জুনের সম্মেলনও হয়নি। কবে নাগাদ এই সম্মেলন হবে বা এ বছর আদৌ হবে কি না, এ নিয়ে চরম দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগছেন নেতা-কর্মীরা।

কিন্তু বারবার কেন এমন হচ্ছে? জেলা বিএনপির নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক নেতা জানান, মূলত মন্ত্রী তরিকুল ইসলাম এবং তার পক্ষের নেতা-কর্মীরা চাচ্ছেন না বলেই সম্মেলন হচ্ছে না। তাদের না চাওয়ার মূল কারণ হলো, দলের নিয়ন্ত্রণ হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা। ঐ নেতার দাবি, বর্তমান কমিটিতে যারা আছেন তাদের সিংহভাগই মন্ত্রী তরিকুল ইসলামের আস্থাভাজন। তিনি রুষ্ট হন এমন কোনো কাজ তারা করেন না। কিন্তু আগামীতে যারা মূল নেতৃত্বে আসতে চাচ্ছেন তারা তরিকুল ইসলাম পক্ষীয়দের কথা নাও শুনতে পারেন। সূত্রমতে, আগামীতে সভাপতি পদে মফিকুল হাসান তৃপ্তি এবং সাধারণ সম্পাদক পদে নগর বিএনপির সভাপতি দেলোয়ার হোসেন খোকন এবং জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক অ্যাডভোকেট সৈয়দ খায়রুল হক সাবুর মধ্যে যে কেউ নির্বাচিত হয়ে আসতে চান। মূল সমস্যাটি নাকি এখানেই। তরিকুল ইসলাম পক্ষীয়রা কোনোভাবেই চাচ্ছেন না উল্লিখিত তিনজনের কেউই আপাতত গুরুত্বপূর্ণ পদে আসুক। তারা চাচ্ছেন বর্তমান কমিটিই আরেক মেয়াদের জন্য দায়িত্ব পালন করুক। কিন্তু তা মানছে না অপর পক্ষ। এখন কবে নাগাদ এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে তা কেউ বলতে পারছেন না। এ ব্যাপারে জেলা বিএনপির এক নেতার কাছে জানতে চাইলে নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, 'নতুন যারা গুরুত্বপূর্ণ পদে আসতে চাচ্ছে তারা বলুক প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে না, তাহলে আগামী মাসেই সম্মেলন হয়ে যাবে। কিন্তু আমরা তা হতে দেব না। দু'বছরের কমিটির মেয়াদ ৮ বছর হয়ে গেছে। আরো দু'বছরের কথা বলে তারা এক যুগ কাটিয়ে দেবে তা আর হবে না। দলের জন্য কাজ করতে করতে চুল দাড়ি অনেকে পাকিয়ে ফেলেছেন, অথচ সম্মানজনক পদে যেতে পারছেন না সম্মেলন না হওয়ায়। এভাবে চলতে দেয়া যায় না।'

মামুন রহমান

রাজস্ব আদায়ে ব্যর্থ রাজস্ব বোর্ড

রাজস্ব আদায়ের টার্গেট কোনো বছরই পূরণ করতে পারে না সরকার। রাজস্ব প্রশাসনে বিশৃঙ্খলা, অনিয়ম, লক্ষ্যমাত্রা অর্জন না হবার অন্যতম কারণ। মনিটরিং ব্যবস্থার দুর্বলতার সুযোগে রাজস্ব ফাঁকি বেড়ে যাওয়ায় রাজস্ব আদায় কমেছে। পাশাপাশি রয়েছে অসাধু কর্মকর্তাদের যোগসাজশ, যার ফলে রাজস্ব ফাঁকি উৎসাহিত হচ্ছে। এনবিআরের লোকবলের স্বল্পতার কারণেও রাজস্ব আদায় কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে পারছে না বলে সংশ্লিষ্টরা মনে করেন। রাজস্ব আদায়ে নতুন নতুন কৌশল গ্রহণ করা হলেও গত ১০ বছরে এনবিআরে কোনো নতুন নিয়োগ হয়নি। এরপরও নতুন অর্থবছরের জন্য অর্থমন্ত্রী বড় আকারের রাজস্ব পরিকল্পনা করেছেন। নতুন অর্থ বছরে রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ৪৫ হাজার কোটি টাকার বেশি ধরা হয়েছে। এর মধ্যে এনবিআরের অংশ ৩৫ হাজার কোটি টাকারও বেশি এবং রাজস্ব বোর্ডবহির্ভূত কর খাত থেকে আসবে ৯ হাজার কোটি টাকারও বেশি।

চলতি অর্থবছরে রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে এনবিআর ব্যাপক অভিযান চালানোর পাশাপাশি সফল কর্মকর্তাদের পুরস্কারের পরিমাণ দ্বিগুণ করার পরিকল্পনা নিয়েছে। গত অর্থবছরে এনবিআর সফল কর্মকর্তার পুরস্কার হিসেবে দেড় কোটি টাকা দিয়েছে। এনবিআরের চেয়ারম্যান খায়রুজ্জামান চৌধুরী এপ্রসঙ্গে সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেছেন, 'চলতি অর্থবছরে পুরস্কারের পরিমাণ ৩ কোটি টাকায় উন্নীত করার পরিকল্পনা নেয়া হচ্ছে। এতে এনবিআরের কর্মকর্তারা রাজস্ব আদায়ে উৎসাহিত হবেন।'

অর্থনীতিবিদ ড. আতিউর রহমান আদায় প্রক্রিয়ার গলদের কারণে রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত না থাকার কথা প্রতিবেদককে জানালেন। তিনি পোস্ট অফিস ও ব্যাংকের মাধ্যমে কর প্রদানের ব্যবস্থা করার ওপর গুরুত্ব দেন। তার মতে, জটিলতা এড়িয়ে করদাতারা এসব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে করদানে উৎসাহী হবেন। বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সভাপতি ড. খলীকুজ্জমান আহমেদ ২০০০কে বলেছেন, 'মানুষ ভ্যাট, ট্যাক্স ঠিকই দিচ্ছে কিন্তু ভ্যাট-ট্যাক্স আদায়কারী ও প্রদানকারীদের যোগসাজশের কারণে সরকার রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।'

প্রতিবছর রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত না হওয়ায় রাজস্ব খাত সংস্কারের জন্য সরকারের ওপর রয়েছে আইএমএফের চাপ। প্রতিবছর উচ্চাভিলাষী লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত না হওয়ার জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করেছে আইএমএফ। এ জন্য তারা রাজস্ব খাত সংস্কারের পাশাপাশি বেসরকারি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে রাজস্ব আদায়ের পরামর্শ দিয়েছে। কর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দুর্নীতি কমানো এবং কর প্রদান প্রক্রিয়া সহজীকরণেরও পরামর্শ দিয়েছে।

এহ্সানুল করিম